ভোরের কাগজ

তারিখ ... 17 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

ছাত্র-বিচ্ছিন্ন ছাত্ররাজনীতি

আহমেদ মাতীন

আমাদের ছাত্ররাজনীতির অতীত যতোই গৌরবোজ্জ্বল হোক না কেন এর বর্তমান অবস্থা নিয়ে গৌরব করার মতো কিছু খুঁজে পাওয়া মনে হয় কঠিনই হবে। শুধু তাই নয়, অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে—বর্তমানে ছাত্রনেতা বললে সাধারণ মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ম্যাসলম্যান বলেই ধরে নেয়। তার ওপর, সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ ঘটনায় কতিপয় ছাত্রনেতা জড়িত থাকায় মানুষের সে ধারণায় যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

এতো গেলো একদিক, অন্য একটি বিষয় বর্তমানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বর্তমান সময়ে ছাত্ররাজনৈতিক দলসমূহের ভৌত অবস্থান, আচরণ ও সামগ্রিক তৎপরতা বিচার করে দেখলে তাদের যেন সাধারণ ছাত্রসমাজের সঙ্গে যথেষ্ট সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের সকল শিক্ষাঙ্গনের ছাত্ররাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা সারা বছর, প্রধানত দুটি কাজেই ব্যস্ত থাকে। প্রথমত, দলের পরিধি ও প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা। এ জন্য তারা ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষাঙ্গনের প্রায় সকল প্রশাসনিক ও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক উদাহরণ, শাহজালাল ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা। অতীতেরও অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উপার্জন প্রচেষ্টা। প্রতিটি দলেরই প্রথম সারির নেতৃবর্গ অত্যন্ত ব্যয়বহুল জীবনযাপন করেন। তাদের উপার্জনের উৎস যথেষ্ট স্পষ্ট না হলেও সাধারণভাবে সবদলই যে অনেক অনিয়মতান্ত্রিক উপার্জন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তা এখন প্রায় সর্বজনবিদিত। শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে (এমনকি বাইরেও) নির্মাণকাজ নিয়ে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি এবং ছিনতাইয়ের সঙ্গেও এসব ছাত্ররাজনৈতিক কর্মীদের সংশ্লিষ্টতার অনেক উদাহরণ, খবরের পাতা খুঁজলে প্রায়ই পাওয়া যায়। তবে একেবারে সাম্প্রতিক উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল মহসিন নামক জনৈক ছাত্র ক্যাডার কর্তৃক এক ব্যবসায়ী অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা। উপরোক্ত দুটি কাজেই তারা ব্যবহার করে দলীয় সন্ত্রাসী শক্তি এবং উচ্চতর মহল থেকে দলীয় মুরব্বিদের (গডফাদার) প্রভাব। দুটি কাজই যেমন আইন ও রীতিগর্হিত তেমনি সাধারণ ছাত্রসমাজেরও সংশ্লেষবর্জিত।

আর অন্যদিক থেকে বলা যায়, ছাত্ররাজনৈতিক দলগুলোর প্রায় কোনো কর্মতৎপরতাই সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সাধারণ ছাত্রদের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ বিষয়ের সঙ্গেও এসব ছাত্র সংগঠনকে যুক্ত হতে দেখা যায় না। অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমি কেবল দুএকটি উল্লেখ করবো।

(ক) শিক্ষানীতি সম্ভবত এ সময়ের বিশেষভাবে আলোচিত এবং শিক্ষা বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের একটি। বর্তমান সরকারের আমলে বছরখানেক পূর্বে একটি শিক্ষানীতির প্রস্তাব প্রকাশ করা হয়েছে। যথাযথ পক্ষ-বিপক্ষের যারা এর সমালোচনা কেবল প্রত্যাশিতই নয়, প্রয়োজন। এর ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ, পরিমার্জনা ও পরিপূর্ণতা আনার জন্যই প্রয়োজন। বিস্ময়ের বিষয়, আমাদের সবচেয়ে বড়ো ছাত্র সংগঠন দুটি (ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল) প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে কোনো সেমিনার বা সভার আয়োজন করেনি।

এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন এলাকায় একটি শ্রেণীকক্ষ সমস্যা ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ইদানীং আংশিক সমাধান হয়েছে। শ্রেণীকক্ষের দখল নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাও বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। কিন্তু কোনো ছাত্র সংগঠনই এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

(গ) গত জুলাই '৯৮ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন ও অন্য কয়েকটি 'ফি' বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি সর্বদলীয় ছাত্র আন্দোলন হয়ে গেলো। দৃশ্যত এটি সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে উদ্রিক্ত একটি আন্দোলন বলে মনে হলেও একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে, এটি বহুলাংশেই তা ছিল না। বরং এটি ছিল প্রায় শতভাগ নিছক 'আন্দোলনের জন্য আন্দোলন' বা শুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন।

অন্তত ২৫/৩০ জন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমি এ প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অন্তত তিন-চতুর্থাংশ যেমন তাদের বিদ্যালয় পর্যায়ে ১০০-২০০ টাকা বেতনে পড়ে এসেছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ১০ টাকা কি ২৪ টাকা এটাও প্রায় কারো জন্যই কোনো সমস্যা নয়। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আসল সমস্যা, হলের খাবার খরচ দিন দিন বাড়ছেই। অথচ 'ফাওখোর'দের উৎপাতে তা যেমন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি খাবার মানও ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে। তাছাড়া কোনো কোনো বিভাগ ও অনুষদে নানা ধরনের বিশেষ ফি আদায় করা হচ্ছে বেশ মোটা ধরনেরই। যেমন- বাণিজ্য অনুষদে কয়েক বছর যাবৎ এক থেকে দেড় হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে কম্পিউটার ফি বাবদ। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য এগুলোই সমস্যা। অথচ এ আন্দোলনে এগুলো দাবি হিসেবে আসেনি। না আসার কারণ, আমার মতে উপরোক্ত দ্বিতীয় সমস্যাটি কয়েকটি বিভাগের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলো এ সম্বন্ধে অবহিতই নয়। তাদের তো আর এসব দিতে হয় না। আর প্রথম সমস্যাটি তো রাজনৈতিক দলগুলোরই সৃষ্টি। তাই দেখা যাচ্ছে, এমন দুএকটি গালভরা অথচ অযথার্থ উপলক্ষ (বেতন ও ফি বৃদ্ধি প্রতিরোধ) নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, যা ছাত্রদের সত্যিকার সমস্যা নয়। এ আন্দোলনের ফলাফলটি লক্ষ্য করলেই আরো সহজে বোঝা যায় যে, এ আন্দোলন ও এর ফলাফল দুটোই একেবারে তাৎপর্যহীন। '৯৭ পর্যন্ত প্রথম বর্ষের সর্বমোট বার্ষিক ফি ছিল ১৯২০.০০ (কলা অনুষদ) ও ১৯৪৪.০০ (বিজ্ঞান অনুষদ)। '৯৮-এ তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ২৬৩০.০০ (কলা) ও ২৬৮০.০০ (বিজ্ঞান)। আন্দোলনের ফলে যা কমলো তা হচ্ছে ২৪৮০.০০ (কলা এবং ২৫৩০.০০ (বিজ্ঞান)। এ আন্দোলন থেকে আরো প্রমাণ হয় যে, ছাত্রদের সত্যিকার সমস্যাগুলো সম্বন্ধে ছাত্র সংগঠনগুলো অবহিতই নয়।

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আসল সমস্যা, হলের খাবার খরচ দিন দিন বাড়ছেই। অথচ 'ফাওখোর'দের উৎপাতে তা যেমন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি খাবার মানও ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে। তাছাড়া কোনো কোনো বিভাগ ও অনুষদে নানা ধরনের বিশেষ ফি আদায় করা হচ্ছে বেশ মোটা ধরনেরই। যেমন- বাণিজ্য অনুষদে কয়েক বছর যাবৎ এক থেকে দেড় হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে কম্পিউটার ফি বাবদ। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য এগুলোই সমস্যা। অথচ এ আন্দোলনে এগুলো দাবি হিসেবে আসেনি।

ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ কর্মীদের ব্যক্তি পর্যায়ে বিবেচনা করলেও দেখা যায় যে, সাধারণ ছাত্রদের সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হওয়া তাদের পক্ষে খুব সহজ নয়। প্রথমে ছাত্র নেতৃবৃন্দের কথাই ধরা যাক— অফিসিয়াল বিবেচনায় ছাত্র হলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক মানসিকতা এবং প্রত্যাশা ও আচরণে এরা কোনোমতেই ছাত্রদের তুল্য নন। প্রায় প্রত্যেকেই স্ত্রী-সন্তান-সংসার নিয়ে একেকজন পরিণত ও বয়স্ক মানুষ। তাদের দৈনন্দিন কোনো পাঠ নেই, পরীক্ষার দুশ্চিন্তা নেই। তারা হলে থাকেন না, থাকেন সুসজ্জিত, সুপরিসর আবাসে। তারা নিয়মিতই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন নিজের গাড়িতে, হাতে থাকে মোবাইল ফোন। আসেন তবে তাদের গন্তব্য শ্রেণীকক্ষ নয়, ল্যাবরেটরি বা লাইব্রেরি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অবস্থানস্থল ডাকসু অফিস, হল, কখনোবা মধুর ক্যান্টিন। তারা ব্যস্ত থাকেন তাদের রাজনৈতিক মুরব্বিদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের পরিকল্পিত কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনা করা নিয়ে। সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার সময় ও সুযোগ তাদের প্রায় নেই। অন্যদিকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ হলে না থাকলেও তাদের নামে কক্ষ বরাদ্দ থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক দলই কিছু কক্ষ নিজেদের দখলে রাখে। এসব কক্ষে নেতৃবর্গের প্রতিনিধিরা অবস্থান করে। হলে পার্টি বিশেষের দখল ও প্রতিপত্তি এরাই বজায় রাখে। সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে নেতৃবর্গের যোগাযোগ সূত্রও এরাই। কিন্তু কিছুকাল ধরে এ যোগাযোগ ক্ষীণ হতে হতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ বর্তমান রাজনৈতিক কর্মী তথা ক্যাডারদের সঙ্গে ছাত্রদের প্রকৃতিগত পার্থক্য। আগে ক্যাডার সংগ্রহ করা হতো ছাত্রদের মধ্য থেকে। দেখা গেছে, কাজটি বেশ কঠিন ও খরচ সাপেক্ষ। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে কঠিন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তার সামনে থাকে একটি সুন্দর স্বপ্ন, একটি ধীমান উচ্চাশা ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং ভিতরে থাকে একটি আদর্শিক মূল্যবোধ এবং একটি দুশ্ছেদ্য পারিবারিক বাৎসল্য ও দায়িত্বের বন্ধন। এ দুটো সুদৃঢ় অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে তাকে পথভ্রষ্ট করা সহজ হয় না। প্রলোভনের সঙ্গে চরম ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির দ্বারাই তা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে ক্যাডার সংগ্রহ করা হয় প্রধানত বস্তি এলাকা থেকে। এসব এলাকার উঠতি বয়সের ছেলেগুলো যেমন বেপরোয়া কর্মক্ষম তেমনি সুলভ। কারণ এরা প্রায় শিক্ষাহীন, উঠে আসে প্রায় স্নেহহীন চরম দরিদ্র-পরিবেশ থেকে সমাজ ও জীবনের কুৎসিততম অভিজ্ঞতা নিয়ে। এদের সামনেও থাকে না কোনো স্বপ্ন। যা থাকে তা কেবল নিকষ অন্ধকার অথবা অস্পষ্ট অশুভ। সেজন্য এদের থাকে না মৃত্যুভয়ও। তাই এরা অল্পেই পরিতুষ্ট। দুএক প্রস্ত আধুনিক পোশাক, এক প্রস্ত পাদুকা, হলের ফাও আহার ও আশ্রয়, কিছু পকেটমানি আর একটি 'যন্ত্র'- ব্যস, নীতিবোধহীন, প্রশ্নহীন, জান্তব আনুগত্য নিয়ে আজ্ঞা বহনের জন্য এরা সদা প্রস্তুত। ছাত্র ক্যাডারদের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের কমবেশি যোগাযোগ থাকতোই। কিন্তু এরা ছাত্রদের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন এবং অবস্থানগত পার্থক্যের জন্য তাদের প্রতি প্রায়শ ঈর্ষা ও বৈরী ভাবাপন্ন। সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রনেতাদের মধ্যকার দূরত্ব আরো বিস্তৃত ও সুরক্ষিতই হয়েছে এদের আগমনে।

এ কথা বলার অ
ছাত্ররাজনীতির সূচনা হ
তাদের হয়ে কথা বল
একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক
ছিল এর প্রধান কাজ।
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতী
অবদান রাখতে শুরু
অব্যবহিত পর থেকেই পা
পাকিস্তানি বাঙালিদের
বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ
সবচেয়ে সোচ্চার। ভাষা
ভূমিকার কথা সবাই জা
জেল জুলুম এবং হত্যা-
নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়
শাসকবর্গ গ্রহণ করলেন
গ্রহণ করা হলো ছাত্ররা
উদ্যোগ। তদানীন্তন
আইয়ুব-ইয়াহিয়ার একা
মোনেম খান হলেন তা
তৈরি হলো সরকার
এনএসএফ। অনেক ঐ
এনএসএফ-এর ঢাকা
আন্দোলন অবদমনে সাফ
হলেও এর সাফল্যকে খা
অবকাশ নেই। কারণ
বিষবৃক্ষ রোপণ করেছি
নতুন করে পুনরায় উদ্বো
জিয়াউর রহমানের দ্বার
সরকারই সে বিষবৃক্ষের
গ্রহণ করেনি; বরং পূর্বাপ
ফলে সে বিষবৃক্ষ আজ
করে মহীরুহে পরিণত
হিসেবে আমরা জানি যে,
শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতাই
একটি করে বা দুএকটি
এবং ষাটের দশকে এ
একক অধিকৃত কক্ষে
সংযোগ ছিল। সেই স
এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের
জন্য সরবরাহকৃত অস্ত্র ও
তুলনা করলেই বোঝ
দুর্বৃত্তায়নে বর্তমান অ
ভয়াবহতা। তাই আজ র
ও অধিকতর প্রভাবশা
সংগঠন আদৌ আছে কি
প্রয়োজন হয়। কিন্তু সন্ত্রা
পুলিশের প্রভাব-নিরপে
নিরাপদ সুযোগ প্রদান
নিরাপত্তা বিধান করেই যা
গোষ্ঠী থেমে যেতো তা
এমন চরম অবক্ষয় ও বি
কিন্তু আরো অনেক বি
সুবিধাই এ রাজনৈতিক
হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।
বিশেষ পর্যায়ে ও রাজ
বিদেশী মিশনে চাকা
প্রধানমন্ত্রীর নৈকট্য ও উ
বিশেষ মর্যাদা ও প্রতি
এমনো দেখা গেছে, বি
সফরসঙ্গী হয়েছেন কো
এসব কিছুর সুদূরপ্রসারী
সরকারে। এর ফলে,
নীতিহীনতা ও পশুশ
আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও স
যথার্থ কর্মী মানুষের স
মূল্যবোধ হয়েছে নিরা
দণ্ডিত। তাই দেশের
হিসেবে দুর্বৃত্ততা ও
মর্যাদাজনক ও লোভনীয়
আজ তাই দুর্বলতার নাম

আহমেদ মাতীন : প্রাবন্ধিক
বিশ্ববিদ্যালয়।